জীবনের আয়নায়

স্বামী দিব্যানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

বেলুড় মঠ, হাওড়া - ৭১১২০২

জীবনের আয়নায়

স্বামী দিব্যানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

বেলুড় মঠ, হাওড়া - ৭১১২০২

প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

ISBN ঃ 978-81-934762-8-4

প্রকাশ ঃ মহাষ্টমী, দুর্গোৎসব, ২০১৮

প্রচ্ছদ ঃ নীলাদ্রি শেখর চক্রবর্ত্তী

মুদ্রক ঃ সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩, কে.পি. কুমার ষ্ট্রীট, বালি, হাওড়া
দূরভাষ - ২৬৫৪ ৩৫৩৬

মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র

কথামুখ

জীবনের পথ ধরে চলতে চলতে কত যে বিচিত্র ছবি চোখে পড়ে, আমরা তার ইয়ত্তা করতে পারি না! দারিদ্র্য তাকে বিবর্ণ করতে পারে না। সংগ্রামের ঘামে ভিজেও তা আশ্চর্য রঙিন! দুচোখ ভরে দেখি। আনন্দে কী এক অব্যক্ত আবেগ বুক ঠেলে চোখে আসে। তারপর নীরবে চোখ উপচে নামে গঙ্গা-যমুনা। জীবন আর তখন কঠিন পথ থাকে না। জীবন হয়ে যায় মসৃণ, নদীর মতো। সেই জীবন-নদীর অতলান্ত গভীরে থাকে মণি-মানিক। আমরা গভীরে ডুব দিয়ে খুঁজে ফিরি সেই অরূপরতন। জীবনের আপাত কাঠিন্যকে তুচ্ছ করে কী অফুরন্ত শক্তিতে বৃহত্তর আঙ্গিকে জেগে থাকে অন্তরতর জীবন। তা কখনোই ফুরিয়ে যায় না। আমাদের টেনে নিয়ে যায় জীবনের নিহিতার্থের দিকে। রক্ত আর ঘাম মুছে জীবন সেখানে অনন্যসুন্দর। মরণের স্থির চোখে চোখ রেখে সেখানে মাথা তোলে প্রত্যয়ী জীবন, চৈতন্যময় অপরিমেয় জীবন। খণ্ডিত দৃষ্টির আড়াল সরিয়ে রেখে জীবন সেখানে অখণ্ড মৌনতায় স্থির হয়ে থাকে। সেই নিভৃত প্রাণের দেবতাকে আমরা প্রণাম করি।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসিবৃন্দ মানুষকে কত কাছ থেকে দেখেন। তাদের পাশে দাঁড়ান। তাদের সেবা করতে পেরে ধন্য বোধ করেন। এই মানুষদের শরীরে আছে অপুষ্টি, গায়ে কাদা আর মাটির গন্ধ। আছে তথাকথিত শিক্ষার অভাব, আর আছে বঞ্চনার জ্বালা। পরিপার্শ্বের নির্দয় চাপে খুইয়ে ফেলা জীবনের শ্রী। তবু তারা স্বপ্ন দেখে। একথা রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী মানবসমাজ বুক ঠুকে বলতে পারেন। কারণ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবার হাত তাদের স্পর্শ করতেই তাদের চোখে জ্বলে ওঠে স্বপ্নের প্রদীপ। সেই নির্মল আলোর পথে চলেছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে বিশ্বাসী পৃথিবীর অগণিত মানুষজন। এভাবে পথ চলার উত্তরাধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কারণ, তিনি বলেছেনঃ "তোমরা যাকে ভুল করে বল

মানুষ, আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরের উপাসনা করি।" আজ আমরা জীবনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টায় ব্রতী হতে চেষ্টা করি।

জীবনের আয়নায় অনেক ছবি জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের মানুষজনের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। জীবনের আয়নায় প্রতিফলিত সেইসব জীবন-চিত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকার পাঠকবর্গের মন ছুঁয়ে গেছে। জীবনের আয়নায় রূপ থেকে ভাবে উত্তরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থেকেছে। শব্দ বা রূপের ইঙ্গিত অথবা ঘটনার ঘনঘটার মধ্য দিয়ে জীবনের গভীরতর সত্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছি, যাকে কবিতার আঙ্গিকে বলা চলে—'A new knowledge of reality'। অন্যদিকে পাঠকবর্গের অনুভূতির তরঙ্গ আমাকেও আনন্দ দিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে গভীরভাবে। অজস্র চিঠিপত্র ও টেলিফোনে ফিরে আসা পাঠকবর্গের আন্তরিক ও একান্ত জীবনবোধ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে চিরায়ত আসনে। এই বিনির্মাণের দিকে তাকিয়ে আপ্লুত না হয়ে পারিনি। তাই 'উদ্বোধন'-এর পাঠকবর্গকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত জীবনাভিজ্ঞতার সেই ছবিগুলিকেই এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করা হলো।

জীবনের আয়নায়

আমি তখন কলকাতার কাছে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছি। শনিবার অর্ধদিবস আর রবিবার ছুটির দিন। কয়েকজন ডাক্তার আর ওষুধপত্র সঙ্গে নিয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে কলকাতার ব্যস্ত জনপদ ছেড়ে সুন্দরবনের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে চলে যেতাম। স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্পণের অছিলায় জীবনকে দেখার আগ্রহ ছিল বেশি। দারিদ্র্য আর অশিক্ষাকে কেন্দ্র করে দিনযাপনের গ্লানির ভারে ন্যুব্জ মানুষজন কি অদ্ভুত শক্তিতে মাথা তুলেছে! অর্থের বৈভব আর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারকে হতমান করে অন্তরের ঐশ্বর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে তাদের হৃদয়। সহমর্মিতা আর মানবিক মূল্যবোধের দ্যুতিতে ঝলমল করছে সেইসব অনন্য জীবন। আজ সেই অনন্য জীবনের টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে মালা গাঁথায় সামিল হয়েছি। সেই মালার পরতে পরতে বিধৃত হয়ে আছে ত্যাগের জীবনের অমল সৌন্দর্য এবং সেবার মাধুর্যমণ্ডিত ঘ্রাণ।

সুন্দরবনের বনবিভাগের একটি দপ্তরে বসে আছি। রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে চা-সহযোগে কথাবার্তা হচ্ছে। হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি এলেন। শুকনো চেহারা, শোকার্ত মুখ, মলিন জামা-কাপড়। দিন দুয়েক আগে তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে মধু সংগ্রহের জন্য গভীর অরণ্যে গিয়েছিলেন। তাঁরই চোখের সামনে চকিতে সেই বড় আদরের ভাই বাঘের খাবারে পরিণত হয়ে গেল! চিৎকার করতেও ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতা তাঁকে এতটাই বিহ্বল করেছিল যে, ভাঙা বুক নিয়ে বাড়ি ফিরে ভাল করে কথা বলতে পারেননি। সেদিন রেঞ্জার সাহেবের দপ্তরে এসে বানভাসি কান্নায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন তিনি। তাঁরা দুজনে সরকারিভাবে নথিভুক্ত মধুসংগ্রাহক ছিলেন না। মৃত ভাইয়ের পরিচয়পত্র দপ্তরে জমা দিয়ে বিদায় নিলেন। জীবন-সংগ্রামী সুন্দরবনের মানুষের জীবনে এমন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তাঁদের বেদনার রক্তে রঞ্জিত করে রেখেছে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাঁরা এই ভবিতব্যের কাছে নিজেদের

সঁপে দিতে বাধ্য হলেও জীবন-সংগ্রামে পিছপা হননি। রেঞ্জার সাহেবের দপ্তরে হঠাৎ যেন বিষণ্ণ স্তব্ধতা নেমে এল।

সুন্দরবনের সর্দারপাড়া অঞ্চলের মাটি ছুঁয়ে বয়ে গেছে রায়মঙ্গল। সেই সর্দারপাড়া লঞ্চঘাটের কাছেই সেন্টু মণ্ডলের বাড়ি। কাজ শেষ করে কলকাতা ফিরে আসার সময় নেই। জঙ্গলের ছায়ায় আর নদীর কালো জলে তখন ক্লান্তির ঘুম নেমেছে। দুজন সহকর্মী যুবককে সঙ্গে নিয়ে সেন্টু মণ্ডলের বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করতে হলো। সন্ধ্যায় হ্যারিকেনের আলোয় খাওয়া-দাওয়ার পরে একটি ঘরে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে আমরা তিনজন হাঁসফাঁস করতে লাগলাম। অবশেষে সেন্টুদের বাড়ির মানুষজনদের অগোচরে আমরা মাদুর-বালিশ নিয়ে বাড়ির উঠানে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিলাম। চোখে নেমে এল প্রার্থিত ঘুম। ভোরের লঞ্চ ধরতে হবে, তাই শেষ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মাদুরের ওপর উঠে বসে আমি যা দেখলাম তাতে তাজ্জব হয়ে গেলাম। আমাদের অজান্তে বাড়ির সবাই নিঃশব্দে এসে আমাদের তিনজনকে ঘিরে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রয়েছেন। পরম বিস্ময়ে সেন্টুর বাবাকে এই আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেছিলেনঃ "এখানে বাঘ আর সাপের ভীষণ উপদ্রব। প্রচণ্ড গরমে আপনারা বাইরে শুয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনাদের ডাকাডাকি করলে বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে। তাই বাড়ির সবাই আপনাদের ঘিরে শুয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। আপনারা আমাদের অতিথি। ভাবলাম, গভীর রাতে বাঘ অথবা সাপ এলেও প্রথমে আমাদের ক্ষতি করবে। ফলে আপনারা হয়তো রক্ষা পেয়ে যাবেন।" নিজেদের জীবনের মূল্য দিয়ে অতিথিসেবার সেই ঘটনা আশ্চর্য সুর হয়ে আজও আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে চলেছে। তাঁদের জাগ্রত দেবত্ব দিয়ে আমাদের দেবত্বকে স্পর্শ করার বিরল অনুভূতি সেদিন পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম।

সুন্দরবনের একটি অখ্যাত গ্রাম। আমাদের কাজকর্ম শেষ করতে বেলা গড়িয়ে গেছে। আমাদের আহার্য তেমন জোটেনি। সবাই এতটাই মগ্ন হয়ে কাজে সামিল হয়েছে যে, সেসব নিয়ে কেউই ভাববার ফুরসত পায়নি।

এক দরিদ্র জেলে জল-কাদা মেখে অনেক দূর থেকে ক্লান্ত দেহে তাঁর বাড়ি ফিরছেন। তিনি আমাদের লক্ষ্য করেছেন। আমরা হাঁটতে হাঁটতে যখন তাঁর বাড়ি অতিক্রম করছি, তিনি তখন এগিয়ে এসে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পথ অবরোধ করলেন। তাঁর আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে আমরা তাঁর মাটির বাড়ির দাওয়ায় বসলাম। কিছু না খাইয়ে তিনি কিছুতেই আমাদের ছাড়বেন না। ভাত খাওয়ার অনুরোধ কোনরকমে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও আমাদের জন্য কয়েক গ্লাস সরবত এল। সরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই দেখলাম, সেই ভদ্রলোকের দুচোখ বেয়ে আনন্দের নীরব অশ্রু নামছে। অশ্রুর ভাষা আমাদের অজানা নয়। তাই ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

আরেকটি মজার ঘটনার উল্লেখ করে আজ স্মৃতির ঝাঁপি বন্ধ করব। সুন্দরবন অঞ্চলের একটি গ্রামের দুই বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁরা হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমাকে সন্ন্যাসী দেখে প্রণাম করলেন। তাঁদের বয়স আন্দাজ পঁচাত্তর থেকে আশির মধ্যে। দুজনে আমার বয়স নিয়ে আলাপ আলোচনায় মগ্ন হলেন। সরল বিশ্বাস আর অবুঝ আবেগ নিয়ে বিচারপর্ব চলতে থাকল। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। একজন জিজ্ঞাসা করছেনঃ "হ্যাঁরে, মহারাজটার বয়স কত?" অন্যজন উত্তর দিলেনঃ "তা আমাদের মতোই, পঁচাত্তর-আশি হবে।" প্রথমজন বিজ্ঞের মতো বাধা দিয়ে বললেনঃ "নারে, দেড়শো বা তার বেশি হবে। সন্ন্যাসীদের সঠিক বয়স বলা যায় না।" জনান্তিকে বলে রাখি, আমি তখনো চল্লিশে পৌঁছাইনি।

'মা' শব্দটির মধ্যে যে গভীর আবেগ, আশ্রয় আর ব্যঞ্জনা লুকিয়ে থাকে তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চিত্তের প্রখর তাপকে মমতা দিয়ে হরণ করে ছায়ার স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে যিনি ক্লান্তিহীনভাবে আমাদের রক্ষা করেন—তিনিই মা। আমাদের জন্য তাঁর অন্তহীন ক্ষমা, চিরকালের সাগ্রহ অপেক্ষা। মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারলে মিলবে অফুরান আনন্দ আর অপার শান্তি। সন্তান মাকে ভুলে অনেক সময় আপাত আকর্ষণীয় কিছু নিয়ে মেতে ওঠে। দিনান্তে ক্লান্তপদে সর্বাঙ্গে